ইসলামোফোবিয়া

ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড

পাশ্চাত্যে সন্ত্রাসবিরোধী ঘরোয়া যুদ্ধের
ইসলামোফোবিক ও বর্ণবাদী চরিত্র

ইসলামোফোবিয়া

ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড

পাশ্চাত্যে সন্ত্রাসবিরোধী ঘরোয়া যুদ্ধের
ইসলামোফোবিক ও বর্ণবাদী চরিত্র

অরুণ কুন্দনানি

অনুবাদ
আবদুল করিম নোমানী

ভূমিকা
মুসা আল হাফিজ

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

ইসলামোফোবিয়া
ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড
মূল : অরুণ কুন্দনানি
অনুবাদ : আবদুল করিম নোমানী
ভূমিকা : মুসা আল হাফিজ
সম্পাদনা : আবু বকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২২

স্বত্ব
প্রকাশক

আইএসবিএন
978-984-96875-0-4

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮
০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২

বাংলাবাজার পরিবেশক : তারুণ্য প্রকাশন
দোকান নং-১৩, ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

বানান সমন্বয় ও পৃষ্ঠাসজ্জা
মুহিব্বুল্লাহ মামুন

মুদ্রিত মূল্য
৪২০৳ মাত্র

উৎসর্গ

জামিয়া মাদানিয়া রওজাতুল উলুম-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হজরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহ.-এর স্মরণে...

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	০৯
অনুবাদকের কথা	১৩
ভূমিকা	১৭
মুখবন্ধ	২৫
প্রথম অধ্যায় : আদর্শ শত্রু	
ডোর অব হোয়াইটনেস	৬৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : চরমপন্থা প্রতিরোধের রাজনীতি	৮১
কালচারালিস্টদের অবস্থান	৮২
রিফরমিস্ট	৮৯
সাংস্কৃতিক যুদ্ধ	৯২
অভ্যন্তরীণ ফ্রন্ট	৯৫
তৃতীয় অধ্যায় : দ্য মিথ অব র‍্যাডিক্যালাইজেশন	১০৯
সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা	১১৩
র‍্যাডিকেলাইজেশন : একটি ধর্মতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া	১১৬
র‍্যাডিকেলাইজেশন : ধর্মীয়-মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া	১১৮
পুলিশ-পর্যবেক্ষণে র‍্যাডিকেলাইজেশনের ধরন	১২৪
রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ	১৩০
চতুর্থ অধ্যায় : লিবারেল উন্মাদনার শিকড়	১৪৫
এন্টি-টোটালিটারিয়ানিজম	১৫৪
মতাদর্শ ও সহিংসতা	১৬২
মডারেট মুসলিম অন্বেষায়	১৬৭
আইডেন্টিটি লিবারেলিজম	১৬৯

পঞ্চম অধ্যায় : হার্ট অ্যান্ড মাইন্ড ১৭৭

যে ডোবায় সন্ত্রাসীরা সন্তরণ করে ১৮০
মতাদর্শ এবং ঝুঁকি ১৮৩
মতবিরোধ যখন চরমপন্থা ১৮৭
কৌশলগত অপরিহার্যতা ১৯০
চতুর্মুখী নজরদারি ১৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : স্বাধীনতার শত্রুদের জন্য কোনো স্বাধীনতা নেই ২০১

এফবিআই-এর কাছে আমি ইসলামপন্থী ২০৭
প্রভাব সঞ্চারের কেন্দ্র ২২২

সপ্তম অধ্যায় : পোস্ট-বুম ২৩১

বর্ণ, অধিকার এবং চরমপন্থী ২৩৪
দেশীয় বিদ্রোহ ২৪২
ভয়ের সাথে বসবাস ২৪৯

অষ্টম অধ্যায় : একুশ শতকের ক্রুসেডার ২৫৩

ইংরেজ সিংহ জেগেছে! ২৫৮
দ্য শরিয়াহ কন্সপাইরেসি থিওরি ২৬৮
অসলো-র সন্ত্রাসী হামলা ২৭৯

নবম অধ্যায় : নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখ না! ২৮৭

সংহতির অধিকার ২৯১
ভিন্নমতের সুরক্ষা ২৯৬
ওয়ার অন টেরর সমাপ্তির সময় এসেছে ৩০২

প্রকাশকের কথা

আঘাতই প্রত্যাঘাতের জন্ম দেয়—এ এক ঐতিহাসিক সত্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'নিউইয়র্কের ১১ সেপ্টেম্বরের বিমান হামলার ঘটনাটি আমাদের কাছে যতই আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত মনে হোক না কেন, তার সঙ্গে এর পূর্বের ত্রিশ বছরের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক বিশ্বরাজনীতিতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ভূমিকাকে রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়েছে মূলত আমেরিকাই।' 'পশ্চিমা সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে : হিরোশিমা থেকে ড্রোন যুদ্ধ' শিরোনামে প্রকাশিত অধ্যাপক নোম চমস্কি ও আন্দ্রে ভিচেকের আলাপ-আলোচনা-বিষয়ক বইটির পাঠক হয়ে থাকলে বুঝবেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথাটা খুব অতিরঞ্জিত কিছু না। অবশ্য আধুনিক পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও সহিংসতার রাজনৈতিক ব্যবহারের ইতিহাস যদি ঘাঁটতে যাই, তাহলে আমাদের আরও পেছনে যেতে হবে।

আফ্রিকান সমাজবিজ্ঞানী মাহমুদ মামদানি এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি দেখান, আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় বেশির ভাগ রাজনৈতিক হিংসাকেই ইতিহাসের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য মনে করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই হিংসা ইতিহাসের অগ্রগতির ধাত্রী বলে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। উনিশ শতকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে ম্যাক্স ওয়েবার মনে করতেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ ও হিংসার ওপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েমের ওপরেই আধুনিক রাজনীতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। জাতিরাষ্ট্র সে জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হিংসার বিভিন্ন প্রকাশকে একত্র করে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করে নেয়, যা রাষ্ট্রের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কার্যকর আঘাত হানতে পারে। সেই শত্রু রাষ্ট্রের ভেতরে বা বাইরে, যেখানেই থাকুক না কেন। তিনি আলোকপাত করেন, 'এই চিন্তা উনিশ শতকের ইউরোপে বিজ্ঞান, দর্শন, নৃতত্ত্ব থেকে শুরু করে রাজনীতি—প্রায় সর্বত্রই একসময় বেশ ভালোভাবে জেঁকে বসেছিল যে, সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বুক থেকে দুর্বল জাতিদের মুছে দিয়ে সভ্যতার উপকারই করেছে। গোটা ইউরোপের মনোজগৎ তখন এই ধারণায় আচ্ছন্ন যে, সাম্রাজ্যবাদ আসলে সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি অতি আবশ্যিক জরুরি জৈবিক প্রক্রিয়া, যা কিনা প্রকৃতির নিয়মেই দুর্বল জাতিগুলিকে নিশ্চিতরূপে ধ্বংস করে দেয়।' বস্তুত ডারউইনের 'ন্যাচারাল সিলেকশন' তত্ত্বই

এই দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। তবে এই চিন্তার 'অপর পিঠ' বলেও যে কিছু একটা আছে, তা দেখিয়ে দিয়েছেন আলজেরীয় মনোবিদ ও বিপ্লবী তাত্ত্বিক ফ্রাঞ্জ ফানোঁ। সাম্রাজ্যবাদের হিংসার রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় নেটিভের পালটা হিংসা যে কখনো পাশার দান উলটে দিতে পারে, তার সতর্কবাণী প্রথমে উচ্চারণ করেন তিনি। ব্যাপার ঘটেছেও তাই। 'দ্য রেচেড অব আর্থ' গ্রন্থে ফানোঁ লিখেন—উপনিবেশের মানুষ নিজেকে হিংসার মধ্য দিয়ে এবং হিংসার সাহায্যেই মুক্ত করেছে। তার ভাষায়, 'এতদিন যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে একমাত্র বলপ্রয়োগের ভাষাই তারা বুঝতে পারে, আজ সেই তারা বলপ্রয়োগেরই আশ্রয় নিলো...উপনিবেশবাদীরা এতদিন যে যুক্তি আশ্রয় দিচ্ছিল, এবার সেই যুক্তিই তারা ঘুরিয়ে দিলো তাদের দিকে। নেটিভকে ওই যুক্তি উপনিবেশবাদীরাই সরবরাহ করেছে, এবার ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে নেটিভরা পাশার দান উলটে দিয়ে দাবি করল, ঔপনিবেশিকরা কেবল বলপ্রয়োগের ভাষারই মর্ম বুঝতে পারে।' কলোনিয়াল যুগের সমাপ্তি ও কোল্ড ওয়ারের পর ইউরোপের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও সহিংস চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করছে আজকের আমেরিকা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন সামরিক শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যের আর কোনও সীমারেখা থাকেনি। তখন তার আর কোনও প্রতিপক্ষ নেই। এই অভূতপূর্ব অবস্থার ফল হলো, বাকি দুনিয়ার সঙ্গে আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔদ্ধত্য আর দম্ভ। ফলে আজকের যে ৯/১১ এবং বিশ্বজুড়ে আমেরিকা-বিরোধী তৎপরতা, তার সম্পর্কে মাহমুদ মামদানি রায় দেন, মার্কিন ঔদ্ধত্য আর অসহিষ্ণুতার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এটা বেড়ে উঠেছে। বলা যায় মূলত এই একটি লাইনেরই ব্যাখ্যা করেছেন অরুণ কুন্দনানি এই গোটা বইটিতে।

ইসলামোফোবিয়া-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা এমনিতেই আমাদের এখানে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল; তার ওপর এই ধারার আলোচনা নেই বললেই চলে। ইসলামোফোবিয়ার শিকড় কোথায় আর তার ডালপালা কীভাবে কতদূর ছড়িয়েছে, লেখক তার সুলুকসন্ধান করেছেন নির্মোহ গবেষণা ও বিশ্লেষণের চোখে। বইটির মূল প্রেক্ষাপট আমেরিকা ও ব্রিটেন হলেও কাছাকাছি চরিত্র যে সারা বিশ্বের, এমনকি বাংলাদেশেরও; তা সচেতন পাঠকমাত্রই বুঝতে অসুবিধে হবে না। বর্তমান পৃথিবীতে যখন সর্বোচ্চ দ্রুততম হারে বাড়ছে মুসলিম জনসংখ্যা, তখন ইসলামোফোবিয়ার প্রাদুর্ভাবও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন বাড়ছে। কোথাও মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে। ফলে এই সংকটের পেছনের কারণ ও কার্য-কারণ খতিয়ে দেখা সচেতন মুসলিমদের কর্তব্য বলতে হয়। এমন সময়ে এই বইটির প্রকাশ এর গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন' বা 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্ব কী,

কেন, কীভাবে—তা প্র্যাক্টিক্যালি বুঝতে চাইলে এই বইটির বিকল্প নেই। পাঠকদের এমন একটি বই উপহার দিতে পেরে ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স যারপরনাই আনন্দিত।

মূল বইটি ইংরেজি ভাষায় লিখিত হলেও এর বাংলা রূপান্তর হয়েছে মূলত আরবি অনুবাদকে সামনে রেখে। পরবর্তী সময়ে মূল ইংরেজি সংস্করণকে সামনে রেখে দীর্ঘ সময় নিয়ে এর সম্পাদনা করেছেন আবু বকর সিদ্দীক। এ ছাড়াও সম্পাদনা সহযোগিতায় ছিলেন রাকিবুল হাসান, ইরফান সাদিক ও শাহেদ হাসান ভাইয়েরা। বই প্রকাশের মুহূর্তে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকল। অনুবাদক আবদুল করিম নোমানীর একটি অনুবাদ বই ইতিমধ্যেই ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও কিছু পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। এই নবীন ও প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। এখানে বইয়ের নামকরণ নিয়ে কিছু কথা বলতে হয়। মূল ইংরেজি বইয়ের নাম *দ্য মুসলিমস আর কামিং!* বাক্যাংশটি মূলত ড্যানিয়েল পাইপসের একটি আলোচিত ইসলামোফোবিক প্রবন্ধের শিরোনাম, যা ১৯৯০ সালে *ন্যাশনাল রিভিউ* নামক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এই প্রবন্ধে পশ্চিমের মুসলিম অভিবাসীদের ভয়ংকররূপে দেখানো হয়, যেখানে আমাদের লোককথার প্রচলিত 'বর্গী এলো দেশে' ধরনের একটি ভীতি ছড়িয়ে আছে। তো মূল ইংরেজি নাম বা এর হুবহু বাংলা রূপান্তর দিয়ে বইয়ের নামকরণ হলে অধিকাংশ পাঠকদের বুঝতে অসুবিধে হবে এমন বিবেচনায় বর্তমান নামটি নির্বাচিত করা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে এর মূল বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

পরিশেষে পাঠকদের বলতে চাই, বইটি যদি ভালো লাগে, তাহলে অফলাইনে প্রিয়জনদের মাঝে এবং অনলাইনে বন্ধুদের মাঝে আপনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ও নানা সূত্রে যারা এর সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

প্রকাশনার পক্ষে
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকার হেডিং, যেখানে মুসলমানদেরকে ভয়ানক সহিংসরূপে তুলে ধরা হয়। আসলে বাস্তবেই কি মুসলমানরা সহিংস, নাকি এটা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা? বাস্তবতার প্রশ্ন তখন আসবে, যখন মুসলমানদের সহিংসতায় নিহতপ্রাণের সংখ্যা পশ্চিমা সহিংসতার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু পরিসংখ্যান কি এটা বলে? ইরাক-আফগান যুদ্ধে যতসব মানুষ নিহত হয়েছে, মুসলমানদের সহিংসতার হারের বিবেচনায় নিতান্তই কম! আমেরিকান রাজনৈতিক বিশ্লেষক জন মুলার অত্যন্ত হাস্যকরভাবে এর সাদৃশ্য টেনেছেন। তার মতে, প্রত্যেক বছর মুসলমান সন্ত্রাসীদের (!) হাতে যেসব মানুষ নিহত হয়, তার চেয়ে আমেরিকায় বাথটাবে ডুবে মৃত্যুবরণ করা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। তারপরও মুসলমানদের সন্ত্রাস-সহিংসতা নিয়ে তাদের এত মাতামাতি, এত প্রোপাগান্ডা—এটা কি অত্যুক্তি ও বাড়াবাড়ি নয়?

মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ সহিংসতা সম্পৃক্ত করার ফলশ্রুতিই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সব তৎপরতার পেছনে এ একই প্রতিপাদ্য—সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ। তাদের ব্যয়খাতের বৃহৎ অঙ্ক এরই পেছনে খরচ হয়। তাকে নিরসনের জন্য বিভিন্ন সামরিককেন্দ্র, গবেষণাকেন্দ্র। কেন? কারণ কী? মুসলমানরাই তাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বের?

এর উত্তর একটাই, মুসলমানরা পাশ্চাত্যের আদর্শ শত্রু। তাদের যথাযোগ্য শত্রু হওয়ার সবকিছুই মুসলমানদের কাছে আছে। মুসলমানদের আছে আদর্শিক সুদৃঢ়তা, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও সামরিক দক্ষতা—যেমনটা স্যামুয়েল হান্টিংটন বলেন।

যদি বিষয়টি এরূপই হয়, তবে আমেরিকা এ শত্রু মোকাবিলা করার সবকিছুই করবে। তাতে নীতি-নৈতিকতা ও সত্য-মিথ্যার প্রভেদ থাকবে না। তাদের পদক্ষেপ হবে সামরিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক—সকল ক্ষেত্রে। বরং এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য সকল অবলম্বনকে বৈধ করবে। এখান থেকেই পাশ্চাত্য ও আমেরিকার ইসলাম-বিরোধিতার সূত্রপাত।

পাশ্চাত্যে ইসলামকে দেখার দুটি দৃষ্টিকোণ। প্রথমটি নিউকনজার্ভেটিভদের (রক্ষণশীলদের) মধ্যে, দ্বিতীয়টি লিবারেলদের মধ্যে। নিউকনজার্ভেটিভদের মতে ইসলাম মৌলিকভাবে সহিংস, তাই ইসলামকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। আর

লিবারেলদের মতে সহিংসতা বা উগ্রবাদ ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার ফলশ্রুতি। মূল ইসলাম সহিংস নয়; বরং তা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকূলে। তাই তারা অসহিংস লিবারেল ইসলামের প্রবর্তন করে এবং এটাকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করতে চায়।

নাইন-ইলেভেন পরবর্তী কয়েক বছর আমেরিকার তৎপরতা ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তৎকালীন সময়ে দেশীয় পর্যায়ে দৃষ্টি কম ছিল। প্রেসিডেন্ট বুশের শাসনামল পর্যন্ত সময়টাকে এ ব্যাপ্তিতে ধরা যায়। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শাসনামল থেকে শুরু হয় অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া এবং দেশীয় পর্যায়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ ক্ষেত্রটি হয় বহুমাত্রিক। একদিক থেকে মুসলমানদের আইন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে কঠোর পর্যবেক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে ইসলামকে শীতলীকরণের কাজ করা হয়। তারা উদ্ভাবন করে নানা পরিভাষা, সেসবের মধ্যে র‍্যাডিকেলাইজেশন পরিভাষা অন্যতম। তার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, একজন মানুষ প্রাথমিকভাবে চরমপন্থী হয় না। সেটা হতে হতে তার ওপর বয়ে যায় মনো-দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক বহু প্রভাব। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার প্রভাব পড়ে অবয়বে, বেশভূষায়। যেমন : একজন প্রথাগত মুসলিম, ধর্মীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে সে রক্ষণশীল নয়। কিন্তু হঠাৎই সে দাড়ি বড় করতে শুরু করে, প্রথাগত ইসলামিক পোষাক পরিধান করে, পূর্বের জীবনবৃত্তি ত্যাগ করে। অনেকটা বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে ওঠে। এসব নিদর্শন মুসলমানদের ক্ষেত্রে র‍্যাডিকেলাইজেশনের আলামত। এ ছাড়া তার আরও আলামতের মধ্যে রয়েছে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা, ইসলামকে পাশ্চাত্যের বিরোধী করে দেখা ইত্যাদি।

মুসলিমসমাজ পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধারা অতন্ত্য সুদৃঢ়। মোবাইল ট্রেকিং, ইন্টারনেট ব্রাউজকৃত সাইটের ডাটাবেজ সংরক্ষণ, গোপন সিসি ক্যামেরা স্থাপন-সহ আরও অনেক ধারা। মুসলিমসমাজে পদে পদে গাইড নিযুক্ত করে তাদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহও এ পর্যবেক্ষণের ধারায় পড়ে।

এ সবের মাধ্যমে যখন কারও মাঝে র‍্যাডিকেলাইজেশনের আলামত পাওয়া যায়, তখন তাদের আটক করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কখনো সেটা হয় কারাদণ্ড, কখনো হয় মস্তিষ্ক ধোলাই, কখনো হয় আর্থিক প্ররোচনা। কখনো সেটা হয় এসব থেকে আরও ভয়াবহ। র‍্যাডিকেলাইজেশন আক্রান্ত লোকদের পেছনে প্ররোচক নিযুক্ত করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। তারা যদি সন্ত্রাস করতে রাজি হয়, তখন ভুয়া অস্ত্র ধরিয়ে ঘটনাস্থলে সরাসরি গ্রেফতার করা হয়। এরপর দেওয়া হয় দীর্ঘ সময়ের কারাদণ্ড। বক্ষ্যমাণ বইয়ে এ রকম একাধিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন আসি মুসলমানদের একটা মৌলিক প্রশ্নে, মুসলমানরা কী চরমপন্থী? চরমপন্থী হলে কেন তাদের এ চরমপন্থা? এটা ধর্মতাত্ত্বিক কারণে না মনস্তাত্ত্বিক কারণে? মুসলমানদের এ বিষয়ে গবেষণার জন্য পাশ্চাত্যে তৈরি হয়েছে অনেক গবেষণাকেন্দ্র। বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন বক্তব্য। কারও কাছে তা মনস্তাত্ত্বিক, কারও কাছে তা ধর্মতাত্ত্বিক, কারও কাছে তা উভয়টির সমন্বয়। কিন্তু কেউ মুসলমানদের সহিংসতার ক্ষেত্রে নিজেদের দোষকে মূল দেখছে না। ইসলামকেই দোষী সাব্যস্ত করছে। এ গ্রন্থের লেখক সেসব গবেষকদের মতামতকে যথাযথভাবে খণ্ডন করেছেন এবং সাব্যস্ত করেছেন যে, মুসলমানদের সহিংসতা অবলম্বনের কারণ আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি। প্রমাণ হিসেবে তিনি মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী খ্যাত আনোয়ার আওলাকির ঘটনা উল্লেখ করেছেন সবিস্তারে। এ পররাষ্ট্রনীতি মুসলমানদের ক্ষুব্ধ মনোভাব জাগিয়ে তুলছে। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তারা কখনো সহিংসতায় জড়াচ্ছে।

পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের এ দোষ না দেখে সমস্ত দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, আর টার্গেট করছে ইসলামকে। ইসলাম নিয়ে তাদের এ তৎপরতার কারণ কী আগেই বলেছি। তারা পাশ্চাত্যের আদর্শিক শত্রু। বাস্তবিকপক্ষে নাইন-ইলেভেন পরবর্তী বিশ্বে মুসলমানরা পশ্চিমা দেশসমূহে কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, কীভাবে জীবন অতিবাহিত করছে—এ বই তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

বইটি লিখেন ব্রিটিশ গবেষক অরুণ কুন্দনানি, যিনি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতি ও মিডিয়া বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। উক্ত বইয়ে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ" নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন, যা তার দীর্ঘ তিন বছর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন তত্ত্ব-গবেষণার পাশাপাশি ১৬০ জন ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার পাশাপাশি সমালোচনা-পর্যালোচনাও করেন। এ ১৬০ জনের মাঝে যেরূপ রয়েছে আমেরিকা-ইংল্যান্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যারা সন্ত্রাসবিরোধী সক্রিয় যোদ্ধা, তদ্রূপ রয়েছে সন্ত্রাসী হিসেবে অভিযুক্ত মুসলমান ব্যক্তিবর্গ। বইয়ের মূল বিষয়বস্তু নাইন-ইলেভেন পরবর্তী সময়ে ইসলামোফোবিয়ার বিস্তার এবং পশ্চিমা গবেষণায় চরমপন্থাকে কীভাবে ধর্মীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে সুনির্দিষ্ট একটি ধর্মকে পদানত করে কীভাবে তার বিরুদ্ধেই আবার চরমপন্থী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়, তার বিশ্লেষণ। এতে তিনি আলোচনার পরিমণ্ডল সাজিয়েছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে; কখনো অ্যাকাডেমিক পর্যালোচনা, কখনো সংবাদ বিশ্লেষণ, কখনো তাত্ত্বিক সমালোচনা, আবার তুলনামূলক অধ্যয়ন। দীর্ঘ নয়টি অধ্যায়ে বিভিন্ন নান্দনিক শিরোনাম-উপশিরোনামে সাজানো বইটি। তার নিপুণ আলোচনার মাধ্যমে নাইন-ইলেভেন পরবর্তী

প্রেক্ষাপটে কীভাবে চরমপন্থা প্রতিরোধী রাজনীতির সূত্রপাত, পর্যায়ক্রমে ক্রমোন্নতি, পররাষ্ট্রনীতিতে তার প্রভাব ও সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর তার নেতিবাচক প্রক্রিয়া।

আমি বইটি অনুবাদ করি আরবি মাধ্যম থেকে, ফলত কতিপয় ক্ষেত্রে অনুবাদ যথাযথ মূলানুগ হয়নি; ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ভাই আবু বকর সিদ্দীক বিন মুসা দীর্ঘ সময় ধরে বইটির অনুবাদ সংশোধন ও সম্পাদনা করেছেন। পাশাপাশি একাধিক ক্ষেত্রে টীকা সংযোজন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র রাকিবুল হাসান। তাদের জন্য মন থেকে কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ তাদের পরিশ্রম কবুল করে নিন। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা আবদুর রহমান আদ-দাখিল ভাইয়ের প্রতি, যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আবদুল করিম নোমানী
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২
শিক্ষার্থী, গবেষণা বিভাগ,
সেন্টার ফর ইসলামিক থট অ্যান্ড স্টাডিজ

ভূমিকা

পশ্চিমা দুনিয়া অন্য মানব সমাজ থেকে স্বতন্ত্র কোথায়? সে স্বাতন্ত্র্য শুধু ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক নয়, কিংবা নয় কেবল বস্তু ও প্রযুক্তিগত বিচারে; বরং বৌদ্ধিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচারেও। পশ্চিমের বৌদ্ধিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রতিফলিত রূপ দেখা যায় 'আমরা' ও 'তারা'র বিভাজনে। 'আমরা' বলতে যারা ও যা-কিছু পশ্চিমা, 'তারা' বলতে যারা ও যা-কিছু অপশ্চিমা। 'আমরা' হাজির হয়, যা-কিছু ভালো, তা নিয়ে। 'তারা' হাজির হয় বিপরীতভাবে।

এই যে 'আমরা' ও 'তারা'—এর সবচেয়ে প্রকট প্রকাশ ঘটে ইসলামপ্রশ্নে। ইসলামপ্রশ্ন পশ্চিমের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতা। মুসলমানরা পশ্চিমের চোখে অপর ছিল বরাবরই। এর কারণ ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদের থেকে ভিন্ন; অপরদিকে উভয়ের মধ্যে হাজার বছর ধরে বয়ে গেছে দ্বন্দ্বের স্রোত!

ইসলামোফোবিয়া জন্ম নিয়েছে সেই শত্রুতার গর্ভ থেকে। ইসলামপ্রশ্নে পশ্চিমের মনে যে ঘৃণা, ভয় ও জিঘাংসা, তারই রক্তজল থেকে এর বিকাশ ও বিস্তার। ইসলামোফেবিয়া ইসলামধর্ম বা সাধারণভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীতির চর্চা করে, ঘৃণা ও কুসংস্কার ছড়ায়। বিশেষভাবে এটি করে মুসলিমদের একটি ভূ-রাজনৈতিক শক্তি বা সন্ত্রাসবাদের উৎস হিসেবে দেখানোর মধ্য দিয়ে। বহুকাল ধরে পশ্চিমা-মনে ইসলামপ্রশ্ন যে একান্ত লালিত গোপন রোগের আকারে ক্রিয়াশীল, সে ধারাবাহিকতায় সামসময়িক ইসলামোফোবিয়া হলো জৈবিক বা সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরির এক প্রকরণ।

আজকের দুনিয়ায় জ্ঞানক্ষেত্রে 'ইসলামোফোবিয়া' বহুল উচ্চারিত। এটি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক শব্দ, যা পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের বিশেষ সম্পর্ককে বুঝায়। শব্দটি সাইকোপ্যাথলজি থেকে আংশিকভাবে ধার করা, যা ইসলামের ব্যাপারে রুগ্‌ন 'ভয়' বা 'বিদ্বেষে'র প্রতিনিধিত্ব করে। এর অতীত ইতিহাসের পুরোনো অধ্যায় বটে, কিন্তু এর ধারাবাহিকতা কখনো থামেনি এবং এর বর্তমান প্রবলভাবে জীবন্ত।

পাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যে অশান্ত সম্পর্কের দীর্ঘ এক পরিক্রমার ফলে পশ্চিমা মানসিকতায় ইসলামোফোবিয়া একটি স্থির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যার দাবি হলো পাশ্চাত্যজাত সবকিছুরই প্রতিপক্ষ হলো ইসলাম।

সমকালীন সময়ে ইসলামোফোবিয়াকে তাত্ত্বিক পাহারা দেওয়ার কাজে প্রধান প্রভাবক আমেরিকান লেখক স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' গ্রন্থটি, যা আমেরিকার চেয়ে ইউরোপে প্রভাব ফেলছে অনেক বেশি। ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার ফলে ইউরোপ যে ভয় ও আতঙ্কের সম্মুখীন হচ্ছে, তাতে প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছে মুসলিম অভিবাসীগণ। বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই একুশ শতককে পাশ্চাত্য ও ইসলামের ব্যাপক সাংস্কৃতিক সংঘাতের উপর্যুপরি ক্ষেত্র হিসেবে মনে করেন। নাইন-ইলেভেনের ঘটনা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়া বৃদ্ধিতে গভীর প্রভাব ফেলে; বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে মুসলমানরা সন্দেহ, হয়রানি এবং বৈষম্যের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেন। ইসলামোফোবিয়ার বুদ্ধিজীবিতা দাবি করে, ইসলামই এ পরিস্থিতির জন্য একমাত্র দায়ী।

ইসলামোফোবিয়াকে যদি আমরা তার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও আজ অবধি এগিয়ে আসার ধাপগুলো-সহ বুঝতে চাই, তাহলে তার পথপরিক্রমাকে কয়েকটি ধাপে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন :

প্রথমত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে ইসলামের বিস্তৃতি শুরু। পরবর্তী কয়েক শতকে মুসলমানরা রোমানদের পরাজিত করে, তাদের বিশাল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে। ১৬ হিজরিতে (৬৩৬ খ্রি.) ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমকদের পরাজয় ছিল এক সিদ্ধান্তমূলক ঘটনা। এর ফলে রোমানরা আরব অঞ্চলে কর্তৃত্ব হারায়। এ ধারায় পরবর্তী রোমান উত্তরসূরিদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ভয় ও বিদ্বেষ তৈরি হয়। সে বিদ্বেষের আগুন আরও প্রজ্বলিত হয়, যখন মুসলমানরা স্বয়ং পশ্চিমের ভূমিতে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেন এবং শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা ঘটে দ্রুতই। ৯১ হিজরি/৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন বিজয়, ১১৪ হিজরি/৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে টুর্সের যুদ্ধ, ২১২ হিজরি/৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলি-পালের্মো বিজয়, ৮৫৭ হিজরি/১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে উসমানিদের হাতে কনস্টান্টিনোপল বিজয়... ইত্যাদি পশ্চিমা দুনিয়াকে বহুমাত্রিক আশীর্বাদে ঋদ্ধ করলেও এর ফলে খ্রিষ্টীয় অভিঘাত ছিল ভয়াবহ।

মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান ও দ্রুত সম্প্রসারণ এবং ইসলামি সভ্যতার বিকাশকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক—উভয় দিক থেকেই বিপদ হিসেবে দেখে পশ্চিমা বিশ্ব। ইসলাম ও খ্রিষ্টানধর্মের মাঝে ধর্মতাত্ত্বিক মিল (আসমানি ধর্ম) থাকার কারণে উভয়ের সম্পর্কে মেরুকরণ তৈরি হয়। মুসলিমদের মতো খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরাও বিশ্বাস করতে থাকে যে, তাদের ধর্ম শেষ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

খ্রিষ্টানরা নিজেদের ধর্মকে প্রাধান্য দেয়, ইসলামকে করতে থাকে হেয়। ইসলামে ঈসা মাসিহ ও হজরত মরিয়ম আ. পরম শ্রদ্ধায় বরিত হলেও খ্রিষ্টান

দুনিয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিন্দা ও অপমানের ঝড় বইতে থাকে। গির্জার মতে ইসলাম হলো ধর্মচ্যুতির নমুনা। এ ধর্মের প্রচার করে গেছেন এক 'বিভ্রান্ত' নবি; তার আদর্শ খ্রিষ্টবাদের নকল, খ্রিষ্টবাদের জন্য হুমকি। ইতালীয়-মার্কিন বুদ্ধিজীবী জন এসপোসিতো (জন্ম ১৯৪০) দেখান, 'এর ফলে ভয় ও অজ্ঞতা তাদের মাঝে এমন পৌরাণিক ভাবনা তৈরি করে, যা নিতান্তই অমূলক ও নিরর্থক; মুসলমানরা মূর্তিপূজা করে, মিথ্যা ট্রিনিটির উপাসনা করে। মুহাম্মাদ একজন জাদুকর; তিনি রোমের চার্চের অন্যতম প্রধান। পোপ হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হলে বিদ্রোহ করেন এবং আরবে পালিয়ে যান। সেখানে নিজের জন্য একটি ব্যক্তিগত চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফসল হলো ইসলাম!'

দ্বিতীয়ত একাদশ শতাব্দীজুড়ে ইউরোপ নতুন যুগের সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম হচ্ছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ক্রুসেড। তখন ক্রুসেডীয় ভাবনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল প্রথম সহস্রাব্দের শেষে বিশ্বের সমাপ্তি। গির্জা প্রচার করছিল দুঃখের অবসানের পন্থা। সেখানে পরিত্রাণের জন্য জেরুসালেমে তীর্থযাত্রা ছিল একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। আসলেই তখন পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিকদের মাঝে জেরুসালেমে তীর্থযাত্রার হার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তা ক্যাথলিক প্রোপাগান্ডার এমন এক প্যাটার্ন তৈরি করে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের হিস্টরিয়াজাত আবেগমত্ততার মোহনায় মিলিত হয়। তারা চায় খ্রিষ্টের জন্মভূমি ও সমাধিভূমি মুসলমানদের হাতে না থাকুক। ক্যাথলিক গির্জা এ ক্রান্তিলগ্নে নিজেকে ত্রাণকর্তা মনে করে। তারা মুসলিম 'বর্বর'দের হাত থেকে জেরুসালেম মুক্তির প্রতিনিধিত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। তখন ইউরোপীয় মানসিকতা মুসলমানদের প্রতি তাদের স্বাভাবিক শত্রুতার গণ্ডি পেরিয়ে হিস্টরিয়াজাত উন্মত্ত বিদ্বেষে ফেনায়িত হয়।

ফলে প্রথম ক্রুসেড আক্রমণে খ্রিষ্টানদের যে সাড়া, তার সুস্পষ্ট কারণ আমরা নির্ধারণ করতে পারি। এতে শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্বেষই ছিল না; বরং ছিল প্রোপাগান্ডা ও ভুল বুঝাবুঝি; ছিল ইসলাম ও ইসলামের নবির বিরুদ্ধে অলীক ও পৌরাণিক কাহিনির প্রসার। মহানবি হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে নিয়ে ক্রুসেড যেসব প্রোপাগান্ডা ছড়াত, তার কেন্দ্রে ছিল কয়েকটা গালি। যেমন 'চরমপন্থী' 'সন্ত্রাসী' 'ভণ্ডনবী ও 'নারীকামুক' ইত্যাদি। এসব গালি জন্ম নেয় ক্রুসেড যুগের পৌরাণিক কল্পকাহিনির গর্ভ থেকে। আজ যখন ক্রুসেড আবারও মাথা তুলতে চায়, তখন সেই সব গল্প ও গালি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে আবারও। ইসলামোফোবিয়া এগুলোকে নবজীবন দিচ্ছে, বৈশ্বিক বিস্তার দিচ্ছে এবং অপশ্চিমা ইসলামোফোবিকদের মনে ও মুখে তুলে দিচ্ছে। অতীতের ক্রুসেডের মতো আজও ইসলামোফোবিয়ার মূল ভিত্তি প্রোপাগান্ডা, মুসলিমের চরিত্রহত্যা ও বিভিন্ন মিথ্যার জোড়াতালি!

তৃতীয়ত ১৯৮৯ সালে হাজির হয় একটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেক্ষাপট। তখন জার্মানির বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়েছে। মুসলিমবিশ্বে সালমান রুশদিকে নিয়ে দেখা দিয়েছে অস্থিতিশীলতা, একই সময়ে ফ্রান্সে শুরু হয় হিজাব বিতর্ক। তখন বেশ কয়েকটি ঘটনায় ইউরোপীয় মুসলিম সংখ্যালঘুরা চলে আসছে হিংসাদৃষ্টির কেন্দ্রে। তাদের বিশ্বাস ও স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে চলতে থাকে চর্চা। ডেমোগ্রাফিতে মুসলমানদের হার বৃদ্ধির কারণে বিষয়টিকে 'অভিবাসন-সংকট' হিসেবে দেখানো হয়নি শুধু; বরং সেখানেও হাজির করা হয় ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।

সমগ্র ইউরোপে মুসলমানদের সংখ্যা ২৩ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ৫%। এর সাথে যদি তুরস্কের মুসলমানদের যোগ করা তবে সে হার বেড়ে দাঁড়ায় ১৫%। বিষয়টিকে ডানপন্থী-উগ্রবাদীরা 'ইউরোপের ইসলামিকরণ' হিসেবে অভিহিত করে। ফলে সবার মাঝে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ অনেকটা ন্যায্যতা পায়। ইসলাম এক হুমকি, সেটা বলা হতে থাকে নানাভাবে।

চতুর্থত ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা চিন্তকদের বিকৃত প্রচারের অন্ধ অনুবর্তন ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। সেসব চিন্তকদের মাঝে ভলতেয়ার (১৬৯৪–১৭৭৮) অগ্রগণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটি বই লিখেছেন 'সহিংসতা বা নবি মোহাম্মাদ' শিরোনামে। আর্নস্ট রেনান (১৮২৩-১৮৯২) জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রগতিকে ইসলামের সাথে সমন্বয়হীন বলে সাব্যস্ত করেন। ইসলাম সম্পর্কে এই অবস্থান শুধু এসব চিন্তকদেরই না; বরং বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক মহলে চলছে এ ধরনের বিকৃতি, বিদ্বেষ বা অজ্ঞতার চর্চা। ফলে এমন প্রজন্ম তৈরি হতে থাকে, ইসলাম সম্পর্কে যাদের জানার শুরু ও শেষ হলো এটি প্রতিক্রিয়াশীলতা, নারীবৈরিতা, বর্বরতা ও সন্ত্রাস!

পঞ্চমত ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপের যে ভীতি, তার মূলে হয় অজ্ঞতা আছে, নয় আছে বর্ণবাদী মন। কারণ ইসলামের যে চেহারা তারা উপস্থাপন করেন, তা ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। অতীতে সেটা অব্যাহতভাবে চলে এলেও আজও কেন এ ধারা চলমান? পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে বিশ্ব এখন বিশ্বায়নের মধ্যদুপুরে। জাতিসমূহকে জানা, পারস্পরিক আদান-প্রদান, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিনিময়, পুরোনো অজ্ঞতা অতিক্রম করে জ্ঞানালোকের ভিত্তিতে সহাবস্থান বিশ্বায়নের দাবি। কিন্তু ইসলামের প্রশ্নে সেটা হবে না কেন? হলেও সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কম মাত্রায়। উলটো বরং পশ্চিমা দুনিয়ায় বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটি বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। ফ্রান্সে হিজাব-বুরকিনি বিতর্ক, সুইজারল্যান্ডে মিনার নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা, ডেমার্কে ব্যাঙ্গচিত্র, ব্রিটেন-কানাডায় মসজিদে আক্রমণ, আমেরিকায় পদ্ধতিগত মুসলিম বিতাড়ন ইত্যাদির মধ্যে সেই সংকটের স্বরূপ কিছুটা হলেও স্পষ্ট। তারপরও অনেক চিন্তক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন, যারা

ইসলাম নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং সঠিক উপলব্ধি তাদেরকে ইসলামে নিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে আছেন মরোক্কে জার্মান রাষ্ট্রদূত মুরাদ হোফম্যান (১৯৩১-২০২০) প্রসিদ্ধ ফরাসি চিন্তক রজার গারুদি (১৯৩৩-২০১২) টনি ব্লেয়ারের শালিকা লরেন বুথ (১৯৬৭-)-সহ অনেকে, অনেকেই। পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার চিত্র ধরা পড়ে নাইন-ইলেভেনের পর কুরআন অধিক ক্রয়কৃত গ্রন্থের তালিকায় ওঠে আসার প্রেক্ষাপটে। লোকেরা আল-কুরআন ক্রয় করছিল খুব। কারণ তারা মনে করত কুরআনে এ আক্রমণের কারণ ও প্রেক্ষাপট খুঁজে পাওয়া যাবে।

ষষ্ঠত প্রাচ্যবাদ ও ইসলাম বিকৃতির অনুসন্ধান : বিপুলসংখ্যক প্রাচ্যবিদ ইসলাম ও মুসলমানদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেন। ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব তৈরিতে যার প্রভাব অনেক বেশি। কখনো ইচ্ছেকৃতভাবে তারা নিজেদের উপস্থাপিত তথ্যের আলোকে উপসংহার সাজায়, কখনো ঐতিহাসিক বিকৃতির মাধ্যমে মুসলমানদের অতীতকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, ধর্মকে হাজির করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। মুসলিম সংস্কৃতির হীন ও হেয় চিত্রায়ণে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস চালায়। ইসলামের অকাট্য ও মৌলিক বিষয়গুলোতে সন্দেহ উত্থাপন করে এবং তার যথাযথ অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করতে চায়।

সপ্তমত বার্নাড লুইস ও 'ইসলামি ঝুঁকি'র সমীকরণ। ইহুদি বংশোদ্ভুত এ চিন্তাবিদ পাশ্চাত্যকে ইসলামের সাথে সংঘর্ষিকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে স্যামুয়েল হান্টিংটনের পথিকৃত। তিনি মিথ্যা 'ইসলামি ঝুঁকি' ও 'ইউরোবিয়া' (ইউরোপের আরবিকরণ) নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে লেখালেখি করেন। জোরেশোরে এক কল্পিত সম্ভাবনাকে রাষ্ট্র করেন যে, একুশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। বার্নার্ড লুইস জনপ্রিয় হন। তার জনপ্রিয়তার পেছনে ছিল দুই কারণ।

১. তিনি ইতিহাসকে আংশিকভাবে নিজের অনুমান ও যুক্তির অনুকূলে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনেকটা পারঙ্গম।

২. ইসলামি অনুপ্রবেশের ভয় ছড়ানো এবং মুসলমানদের ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে সব মহলের কাছে তার প্রস্তাবনা।

অষ্টমত মুসলিমদের নানা প্রান্তিকতা, আচরণের সমস্যা, স্থানীয় সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামকে বুঝা ও বোঝানোর চেষ্টা পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলাম হিসেবে এমন কিছুকে উপস্থাপন করে, যা ইসলাম নয়। পাকিস্তান-জর্ডান-লেবানন ইত্যাদির বিভিন্ন গোত্রে অনার কিলিং বা সম্মান রক্ষার জন্য হত্যার কুসংস্কার রয়েছে। নারীরাই হয় এর প্রধান শিকার। এ জন্য দায়ী করা হয় ইসলামকে। কিন্তু ইসলামের সাথে এর কোনো যোগসূত্র নেই। ইসলাম এর বিরোধী বরং। ভারতে

হিন্দুসমাজে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশে খ্রিষ্টানসমাজে এর চল এখনো নিঃশেষিত হয়নি।

ইসলামকে প্রধানত সেভাবেই দেখা হচ্ছে, মিডিয়া যেভাবে দেখাচ্ছে। এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ইসলাম সম্পর্কে ভুল জানা।

পলিটিকস ফার্স্ট ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক মারকাস পাপাদোপুলাসের মত হচ্ছে, ব্রিটেন এবং পশ্চিমা দেশে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। প্রেস টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ব্রিটেনের লোকজন ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিধান্বিত। কারণ তারা সঠিকভাবে ইসলামের বিষয়গুলো জানে না। তারা মনে করে ইরাক ও সিরিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট ইসলাম সম্পর্কে যা-কিছু বলে, সেটাই হচ্ছে ইসলামের সত্য। ফলে সভ্যতা, মানবতা ও শান্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা একে ভাবতে শিখে।

নবমত বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে ইসলামোফোবিয়া বৃদ্ধির অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট নাইন-ইলেভেন। বরং তাকে সামগ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের পেছনে দায়ী করা যায়। নাইন-ইলেভেন পরবর্তী পশ্চিমা রাজনীতির পর্যায়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, 'ইসলামি চরমপন্থা' রোধের নামে উলটো নিজেরাই চরমপন্থা অবলম্বন করছে। মুসলমানদের ওপর পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি চালিয়ে তাদের নাগরিক অধিকারকে সঙ্কোচিত করেছে, সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করেছে বিভিন্ন পরিভাষায়। তারা মুসলমানদের বিভাজিত করছে চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থী হিসেবে। তারা যাতে পশ্চিমা ব্যবস্থার বিকল্পে দাঁড়াতে না পারে, সে জন্য প্রণয়ন করছে লিবারেল ইসলাম; সে জন্য ব্যয় করছে বিরাট অঙ্কের বাজেট, আর্থিক প্রলোভনের নানা ছুতো।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা এতসব তৎপরতার অন্যতম কারণ হচ্ছে পাশ্চাত্যের ইসলামোফোবিক চোখে তারা আদর্শিক শত্রু। হান্টিংটনের ভাষায় মুসলমানদের আছে আদর্শিক দৃঢ়তা, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও সামরিক দক্ষতা। বিষয়টি যদি এরূপই হয়, তবে আমেরিকা এ শত্রুর মোকাবিলায় সবকিছুই করবে। তাতে নীতি-নৈতিকতা ও সত্য-মিথ্যার প্রভেদ থাকবে না। তাদের পদক্ষেপ হবে সামরিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক—সকল ক্ষেত্রে। বরং এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য সকল অবলম্বনকে বৈধ করবে। এখান থেকেই পাশ্চাত্য ও আমেরিকার ইসলাম-বিরোধিতার নতুন যুগের সূত্রপাত।

এই যে বিষয়গুলো, এর মধ্যে নিহিত আছে ইসলাম-বিদ্বেষের ঐতিহাসিক ধারাপাত। এতে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে যে তীব্রতায় ইসলামোফোবিয়া বাড়ছে, তা

সহসা-উদ্ভূত নয়; বরং এক ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার কাঠামোর মধ্যে তা বেড়ে উঠেছে।

একে বুঝা ও এর ধারা ও ধরনসমূহের মোকাবিলা করা শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, বিশ্বশান্তির জন্য জরুরি। কারণ ইসলামোফেবিয়া নাজিজমের মতোই কথা বলে। যার একদিকে থাকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি, অপরদিকে থাকে মুসলিমদের প্রতি ধ্বংসকামী ঘৃণা। সে যখন সক্রিয় হয় এবং যেখানে সক্রিয় হয়, সেখানে কল্যাণ থাকতে পারে না।

ইসলামোফোবিয়াকে বুঝার ও বিশ্লেষণের বিশ্ববিখ্যাত এক বই *ইসলামোফোবিয়া ইন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড*। ইসলামোফোবিয়াকে বুঝার প্রশ্নে নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ এ বই। বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ সাধুবাদযোগ্য। অনুবাদক আবদুল করিম নোমানী আমার প্রীতিভাজন। তার সচল কলম লেখকের ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির তরজমায় সাবলীল থেকেছে।

বইটি পাঠককে সমৃদ্ধ করবে, আশা করাই যায়।

মুসা আল হাফিজ
কবি ও গবেষক

মুখবন্ধ

নিপীড়িতদের ঐতিহ্য আমাদের শিক্ষা দেয়, যে জরুরি অবস্থায় আমরা দিনাতিপাত করি, সেটাই মূলত জীবনের অবলম্বন।

—ওয়াল্টার বেঞ্জামিন,
অন দ্য কনসেপ্ট অব হিস্ট্রি

২৮ অক্টোবর, ২০০৯। ডিয়ারবোর্ন শহর, মিশিগান প্রদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভোর সকাল। চারজন এফবিআই এজেন্টের সেমি-অটোমেটিক রাইফেলের একটানা গুলিবর্ষণে ইমাম লোকমান আব্দুল্লাহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ইমাম লোকমান দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনের টার্গেটে ছিলেন। এফবিআই তাকে সু-পরিকল্পিতভাবে সেখানে পাকড়াও করেছিল। এ ছাড়াও পূর্বে তাকে নিরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাহিনী মোতায়েন করা হয়। হত্যাকাণ্ডের সময় সেসব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ষাটজন সদস্য ঘটনাস্থলের গোডাউনটির চারপাশে অবস্থান নেয়। ইমাম লোকমান সেসময় তার চারজন সহকর্মী নিয়ে পিকআপে ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামাদি স্থানান্তর করছিলেন।

ইমাম লোকমান ডেট্রয়েটের মসজিদুল হক-এ দীর্ঘ ত্রিশ বছর ইমামতি করে আসছিলেন। ডেট্রয়েট ছিল একটি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা। সপ্তাহের প্রতি সোমবার তিনি এলাকার লোকদের নিয়ে দাওয়াতের আয়োজন করতেন। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল বেকার কিংবা স্বল্প বেতনের চাকরিজীবী। অধিবাসীদের একটি বড় অংশই এলাকাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এলাকার পোড়াবাড়ি ও জনশূন্যতা এর প্রমাণ বহন করে। বসবাসরত লোকজনকেও তখন খুব সংকীর্ণ পরিবেশে এবং একই বাড়িতে ভাগাভাগি করে থাকতে হচ্ছিল। কারণ, সবাই আলাদা বাসা ভাড়া করার সামর্থ্য রাখত না। মুসলিম-অমুসলিম-নির্বিশেষে সকলকে সহযোগিতার জন্য ইমাম লোকমান ছিলেন সেখানে এক পরিচিত মুখ। এ ক্ষেত্রে তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। সকলের পরিবর্তন নিয়ে ভাবতেন তিনি। ছেলে ওমর রিগ্যানের বক্তব্যে এমনটাই ফুটে ওঠে,

> ‘এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য তার মাঝে ব্যাপক আগ্রহ কাজ করত। তার বিশ্বাস ছিল, ইসলাম মানুষকে মাদকাসক্তি ও বিষণ্নতা (Depression) কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু তিনি সরাসরি ইসলামের দিকে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ না করে ইসলামের চারিত্রিক গুণাবলি গ্রহণ করার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতেন। তিনি মোটেই ভাবগম্ভীর

ছিলেন না। তাই সকলেই তার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতেন। তার বিশ্বাস ছিল, জনগণের অবস্থার পরিবর্তন আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। কারণ, সরকার কখনোই এটা করবে না। তাই তিনি সর্বদা বলতেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করা আবশ্যক। কেননা প্রশাসন আমাদের এভাবে দোষারোপ করে, যেন আমরা নাইন-ইলেভেনের সাথে জড়িত। অথচ এর সাথে আমাদের ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই।'[১]

ইমাম লোকমান মূলত আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। আশির দশকে সামরিক বাহিনী থেকে অবসরের পর তিনি বিষণ্নতা রোগে (Depression) আক্রান্ত হন। এরপর নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর এই ধর্মান্তরিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল জামিল আমিনের। জামিল আমিনও ছিলেন নও-মুসলিম। তার পূর্ব-নাম এইচ. র‍্যাপ ব্রাউন। ষাটের দশকে তিনি Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)-এর নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর বর্ণবাদী নিপীড়নের শিকার SNCC তখন চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেসময় এটি সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গ ক্ষমতায়ন এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করতে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করা শুরু করে। একপর্যায়ে সংগঠনটি 'ব্লাক প্যান্থার পার্টি'র সাথে সংঘবদ্ধ হয়। র‍্যাপ ব্রাউন তাই এফবিআইয়ের ব্ল্যাক রেভুলোশনারি রেভুলোশনারি টার্গেট লিস্টের শীর্ষে ছিলেন এবং দ্রুতই দাঙ্গায় উসকানিদাতা হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৭১ সালে জেলে থাকাকালীন র‍্যাপ ব্রাউন সুন্নি ধারার ইসলামে দীক্ষিত হন। পরবর্তী সময়ে ইমাম লোকমানও বর্ণবাদী অভিজ্ঞতার শিকার হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই উভয়ের একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, ইসলাম বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে ন্যায়নিষ্ঠা বাস্তবায়নের আন্দোলনকে সমর্থন করে। পাশাপাশি ইসলাম ব্যক্তিত্বগঠনের প্রতিও গুরুত্ব দেয় এবং উত্তম জীবনদর্শন পেশ করে। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ইসলামের প্রতি তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টিতে কৃষ্ণাঙ্গদের চরমপন্থী ঐতিহ্য বজায় রাখাকে নিশ্চিত করে। ম্যালকম এক্স-ও এ ধারার ইসলামি মতাদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন। তবে এফবিআই'র কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম (COINTELPRO হিসেবে পরিচিত) গোপনে কৃষ্ণাঙ্গদের সেই আন্দোলনকে অস্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়। ফলে এর কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে।

---

১ ওমর রেগানের সাথে ফোনালাপ, ১৮ জুলাই, ২০১২।

যা-ই হোক, ব্রাউন নিজেই নিজের নাম রেখেছিলেন জামিল আমিন। ১৯৭৬ সালে জেলমুক্তির পর তিনি জর্জিয়ার আটলান্টাতে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে স্থানীয় এলাকায় একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চালু করেন। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি সেই এলাকাকে মাদকমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তার পেছনে সবসময় পুলিশের কড়া নজরদারি থাকত। তারা তাকে সময়ে সময়ে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত। অবশেষে জর্জিয়ার ফুল্টন কাউন্টিতে একটি গোলাগুলির ঘটনায় ভাইস পুলিশ কমিশনারকে গুলি করে হত্যার দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গোলাগুলির ঘটনায় বেঁচে আসা অপর পুলিশের দাবি অনুসারে জামিল আমিনই গুলি চালিয়েছিল। এমনকি পাল্টা গুলিতে তিনিও আহত হয়েছিলেন। অথচ তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্নই ছিল না। অন্যদিকে আরেকজন ব্যক্তিও সেই ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল। কিন্তু পুলিশ তাকে, 'দেশীয় গুয়ান্তানামো' হিসেবে পরিচিত কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের ফ্লোরেন্সের সুপারম্যাক্স কারাগারে পাচার করে দেয়। এখনও তিনি সেখানেই রয়েছেন। এই কারাগারেই মার্কিন প্রশাসন আল-কায়দার ভয়ংকরতম সদস্য হিসেবে অভিযুক্তদের প্রেরণ করে থাকে।

২০০১ সালে ওয়ার অন টেররের সূচনা হলে সকলের মনোযোগ এটিতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পরে। কিন্তু এই সুযোগে ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চরমপন্থী কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাক্টিভিস্টকে কারারুদ্ধ বা হত্যা করা হয়। সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য এফবিআই-এর অভিযানের বলি হতে হয়েছিল অনেককে, যাদের সাথে ওয়ার অন টেররের ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু তখনও জামিল আমিনকে জেল থেকে মুক্ত করার আন্দোলনে ইমাম লোকমান নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কয়েন্টালপ্রো (COINTELPRO) অভিযান চলাকালেই তিনি মানুষকে চরমপন্থার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতেন। যেমনটা ওমর রিগ্যান বলেন, কয়েন্টালপ্রো (COINTELPRO) এর সময় থেকেই তার বাবার একটি 'অসমাপ্ত কাজ' ছিল। কিন্তু তখন ছিল এক প্রেক্ষাপট, আর সেসময় (৯/১১ এর পর) তৈরি হয়েছিল ভিন্ন পটভূমি। প্রশাসন সেসময় কোনো মুসলিমকে চরমপন্থী হিসেবে উপস্থাপনের জন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করেছিল। এটাই আমরা ইমাম লোকমানের ক্ষেত্রে দেখেছি। এফবিআই, লোকমান আব্দুল্লাহকে দেশব্যাপী চরমপন্থী সুন্নি আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে স্বতন্ত্র ইসলামিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক জিহাদের আহ্বান করেন![২] সহজ

২ Criminal Complaint, USA v. Luqman Ameen Abdullah et al., United States District Court for the Eastern District of Michigan, October 27, 2009, 2.

ভাষায়, তিনি আল-কায়েদার মতাদর্শে বিশ্বাসী। এমনকি সংবাদমাধ্যম ম্যালকম এক্স ও মোহাম্মাদ আলীর মতো ষাটের দশকের আরও অনেক ব্যক্তিত্বকেই 'চরমপন্থী মুসলিম' হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকে।

২০০৭ সালে এফবিআই, ইমাম লোকমানের মসজিদে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানোর একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। সেসময় খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এমন একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যে ইমাম লোকমানের আলোচনায় নিয়মিত উপস্থিত থাকত। পুলিশের সাথে দেনদরবারের পর সে ডেট্রয়েট ফিল্ড অফিসের অধীনে কাউন্টার-টেরোরিজম স্কোয়াডে স্ট্রিং অপারেশনে কাজ করতে রাজি হয়। এফবিআই আরও দুজনকে হাত করে গাইড ও গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ দেয়। তাদের মাধ্যমে দীর্ঘ দু-বছর গোপন পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। মসজিদে তার আলোচনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা অনেকের বিরুদ্ধেই অতীতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার রেকর্ড ছিল। কিন্তু সেসময় তাদের দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করার কারণে এফবিআইয়ের পরিকল্পিত ডলারের ফাঁদটি ছিল বেশ লোভনীয়। তাই ইমাম লোকমানের কিছু অনুসারীকে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র স্থানান্তরের কাজের প্রস্তাব দিলে কেন তারা এতে যুক্ত হয়েছিল—সেটা বোঝা কঠিন কোনো ব্যাপার না। অধিকন্তু সেসব জিনিসপত্রের সম্পর্কে তাদের কিছুই জানানো হয়নি। কাজের খোঁজ দেওয়া সেই 'পরিচিত ব্যক্তি' আসলে ছিল এফবিআই এজেন্ট, যে শুরুতেই ইমাম লোকমানের অনুসারীদের একশ ডলার দেয়। দ্বিতীয় দফায়, এফবিআইয়ের গোপন এই এজেন্ট সবাইকে এক হাজার ডলার দেয় এবং পরদিন রাতে আরও পনেরোশত ডলার মজুরি দেওয়ার কথা বলে। তাদের দায়িত্ব ছিল শুধু ডিয়ারবোর্নের একটি গোডাউনের টেলিভিশন সেট ও ল্যাপটপ, এক সেমিট্রেইলার থেকে আরেকটিতে সরানো, যেগুলো ছিল মূলত অন্যের চুরি যাওয়া জিনিসপত্র। যা-ই হোক, ইমাম লোকমানকে এখানে টেনে আনতে পরবর্তী মাসগুলোতে বেশ কয়েকবার একই কাজ করা হয়েছিল। উপযুক্ত কোনো সময়ে অভিযান চালানো হলে ইমাম লোকমান যাতে সেখানে উপস্থিত থাকেন, সেটা নিশ্চিত করতেই বারবার এরূপ করা হয়েছিল।

যেদিন ইমাম লোকমান গোডাউনে আসবেন, ঠিক একদিন আগে তার ব্যাপারে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। সেখানে উল্লেখ করা হয়, তিনি চুরিকৃত মালামাল বিক্রয়, আগ্নেয়াস্ত্র লুণ্ঠন ও গাড়িতে জাল নাম্বারপ্লেট ব্যবহারের সাথে জড়িত। এ পরোয়ানাতে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত থাকার কোনো অভিযোগ না থাকলেও অভিযানে এফবিআইয়ের কাউন্টার-টেরোরিজম স্কোয়াড এবং বিভিন্ন

বাহিনীর সম্মিলনে গঠিত জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স অংশ নেয়। গ্রেফতারের আগেই মৃত্যু হওয়ায় তার ওপর আরোপিত কোনো অভিযোগই আদালতে প্রমাণ করা যায়নি।[৩]

তবে এটা সত্য যে, ইমাম লোকমান মার্কিন প্রশাসনকে নিপীড়ক মনে করতেন। তিনি তার অনুসারীদের এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে বলতেন। ব্লাক প্যান্থার পার্টির অন্যান্য সদস্যদের মতোই তার ও তার অনুসারীদের নিকট অস্ত্র ছিল। কিন্তু এটি একেবারেই স্বাভাবিক একটি বিষয়। তবে এর কোনো প্রমাণ নেই যে, তিনি কোনো সহিংস আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি প্রশাসন-বিদ্বেষী হলেও এমন এক দরিদ্র পল্লীতে বসবাস করতেন, যেখানে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করাই দুঃসাধ্য। একই এলাকায় বসবাসকারী ইমাম লোকমানের বন্ধু এবং আরেকটি মসজিদের অ্যাফ্রো-আমেরিকান ইমাম আব্দুল্লাহ বেই আল-আমিন বলেন, 'পরোয়ানায় তার ব্যাপারে যে উসকানিমূলক দাওয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিছক অমূলক দাবি ছাড়া কিছুই নয়। তা ছাড়া শুধু একজন ল্যাপটপ চোরকে ধরার জন্য এত এত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা এবং হেলিকপ্টার দিয়ে প্রহরা দেওয়ারও-বা কী প্রয়োজন ছিল?'[৪]

এফবিআইয়ের ডেট্রোয়েট ফিল্ড অফিসের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল এজেন্ট এন্ড্রু অ্যারিনা (Andrew Arena) বলেন, 'লোকমান স্থানীয় জঙ্গিনেতা ছিল'। তাকে নির্দিষ্ট করে ইমাম লোকমানের গ্রেফতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা কোনো একজন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনি না; বরং তাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের অন্য কোনো সুবিধাজনক অভিযোগ আনতে হয়।[৫] অর্থাৎ যখন ব্যক্তির আপরাধী হওয়ার কোনো শক্তিশালী প্রমাণ না থাকে, তখন প্রশাসন কর্তৃক বানোয়াট কোনো অপরাধে ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে একই সাথে এই মাত্রার একটি স্ট্রিং অপারেশনকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তার মসজিদভিত্তিক কার্যক্রমকে মৌলবাদ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ, আইন আদালতে জঙ্গিনেতা প্রমাণ করার চাইতে জনমানসের আদালতে সেটা প্রমাণ করা খুবই সহজ।

যা-ই হোক, এফবিআই যখন তাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়, তখন তাদের নিযুক্ত চর, ইমাম লোকমানকে পুনরায় সেই গোডাউনে নিয়ে যায়। পূর্বনির্ধারিত সময়ে তার সহযোগী তিনজন এজেন্ট গুদামে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপর কয়েক ডজন এফবিআই এজেন্ট চতুর্দিক থেকে তাদের ঘেরাও করে ফেলে। ইমাম

---

৩ Ibid, 3.

৪ Interview with Imam Abdullah Bey el-Amin, Detroit, March 31, 2011.

৫ Phone interview with Andrew Arena, April 7, 2011.

লোকমান ও অন্যান্যদের তারা শুয়ে পড়তে এবং হাত উঁচু করতে বলে। অন্য চারজন তাৎক্ষণিকভাবে আদেশ পালন করলেও ইমাম লোকমান একটু দেরি করে ফেলেছিলেন। এরপর প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে, এফবিআই সদস্যদের মনে হয়েছিল তিনি কোথাও অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন। তাই প্রশিক্ষিত কুকুরটি ছেড়ে দেওয়া হয়।

কুকুরটি যখন তার মুখে কামড়ে দেয়, তখন তিনি কুকুরকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। সাথেসাথেই চারজন এফবিআই এজেন্ট ইমাম লোকমানের দিকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। যেহেতু তারা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছিল, তাই তৎক্ষণাৎ তিনি মারা যান। গুদামের ফ্লোরে পড়ে থাকা শায়েখ লোকমানের নিথর দেহকে যখন হ্যান্ডকাফ পরানো হচ্ছিল, তখন পুলিশের কুকুরটিকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এফবিআই কর্মীরা পরবর্তী সময়ে বলেছিল, ইমাম লোকমানকে লক্ষ্য করে যখন গুলি ছোড়া হচ্ছিল, তখন তিনি তাদের দিকে সরাসরি তাকিয়েছিলেন এবং তার চোখে ভয়ের কোনো চিহ্নই ছিল না।[৬]

ইমাম লোকমানের জানাযায় হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়। বিচার বিভাগ রায় দেয়, যেহেতু তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ছিল এবং তিনি যথাযথ সহযোগিতা করেননি, তাই তার মৃত্যু আইনিভাবে ন্যায়সংগত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সরকার যদি তার মসজিদে অনুপ্রবেশ না ঘটাতো এবং নিজেদের বানানো ফাঁদে তাকে না ফেলতো, তবে তাকে এই পরিণতি বরণ করতে হতো না।

***

যা-ই হোক, সংবাদমাধ্যমে ইমাম লোকমানের মৃত্যু নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। কারও মতে তার মৃত্যু ছিল অন্য দশজন অ্যাফ্রো-আমেরিকানের মতোই, যারা প্রতিবছর প্রশাসনের হাতে নিহত হয়। কারও মতে তার মৃত্যু ছিল আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইয়েমেনে ড্রোন হামলায় নিহত হওয়া অন্যান্য সন্ত্রাসীর মতোই। ইমাম লোকমান 'ইসলামি উগ্রপন্থী' কিংবা 'অ্যাফ্রো-আমেরিকান নাগরিক' যেটাই হোন না কেন, সংবাদমাধ্যমের কাছে তার মৃত্যু ছিল পুরোপুরি স্বাভাবিক একটি ঘটনা।[৭] জর্জ ডাব্লিউ বুশের আমলে ওয়ার অন টেরর যদিও অন্যায় যুদ্ধ, দমন-পীড়ন, নির্যাতন এবং নজরদারির কারণে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় এটি আমলাতান্ত্রিক রুটিন ও একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে ওঠে। অথচ ওবামা প্রেসিডেন্ট বুশের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধনীতির

৬ "Report Re: Death of Imam Luqman Ameen Abdullah," Civil Rights Division, United States Department of Justice, October 13, 2010.

৭ Malcolm X Grassroots Movement, "Black People Executed without Trial by Police, Security Guards, and Self-Appointed Law Enforcers, January 1—June 30, 2012," July 16, 2012.